যুগান্তর

11 JAN..
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

হলেও মাস্তানি ও ভোটের বাক্স ছিনতাইয়ের মহড়া দিয়েছে। ফলে গণতান্ত্রিক ও সামরিক বিভাজন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আমাদের দেশের সামরিক শাসকরা কখনোই গণতান্ত্রিক হতে পারেনি, যদিও সেরকম একটি মুখোশ আটার চেষ্টা করেছেন। আবার গণতান্ত্রিক সরকারগুলো স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে গণতন্ত্রের পরিচ্ছদটি খুলে ফেলেছে। তবে বিগত জোটীয় সরকার অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেদের জমিদারি কায়েমের চেষ্টা করেছে।

আমাদের সম্মানিত শিক্ষকরাও বিবেক দ্বারা চালিত হননি কিংবা চালিত হননি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ দ্বারা। তারা চালিত হতে চেয়েছেন ক্ষমতাসীন দলের আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা দ্বারা। এ কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে না পেরে এনামস্বরূপ মেয়াদ শেষে রাষ্ট্রদূতের পদ গ্রহণ করেন। শিক্ষকতায় ফিরতে চান না।

মাধ্যমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি এমনভাবে করা হয়েছে যাতে দলীয়করণের সঙ্গে দুর্নীতি ঢুকে গেছে। খুব কম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই আছে এ থেকে মুক্ত। শিক্ষাভবন নির্মাণ থেকে শুরু করে শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্রভর্তি থেকে বার্ষিক মিলাদ অনুষ্ঠান— সর্বত্র চলছে দুর্নীতি। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে, কারা শিক্ষকদের জিম্মি করে অবৈধ সুবিধা আদায় করছে, সেকথা কর্তৃপক্ষের অজানা নয়। তারপরও তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়নি। বরং কোন অপরাধীকে শনাক্ত করা হলে রাজনীতির লড়াই জমে ওঠে। আমাদের শিক্ষকরা শিক্ষা নিয়ে ভাবেন না, পাঠ্যক্রম উন্নত করতে বৈঠক ডাকেন না, বৈঠক ডাকা হয় দলীয় প্রাধান্য বাড়ানোর জন্য।

স্বাধীনতার পর সর্বত্র ইংরেজি বর্জনের মহড়া চলল। মাতৃভাষার মাধ্যমে সকল শিক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও সে সিদ্ধান্ত কার্যকর করার কোন

দলতন্ত্রকে মোক্ষম ভেবেছেন, আর যারা বন্দুকের নলে ক্ষমতায় এসেছেন তারা ডাণ্ডাতন্ত্র কায়েম করতে সচেষ্ট হয়েছেন। যার সঙ্গে শিক্ষার কোন সম্পর্ক নেই।

স্বাধীনতার পর ছয়টি শিক্ষা কমিশন গঠিত হলেও আমরা অদ্যাবধি একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে পারিনি। যখন যারা ক্ষমতায় এসেছেন তারা একটি করে কমিশন গঠন করেছেন, শিক্ষানীতির নামে সরকারি কোষাগার থেকে কোটি কোটি টাকা খরচ করেছেন, কমিশন সদস্যরা বিদেশ সফরে গিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, কিন্তু শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের কোন কার্যকর পদক্ষেপ লক্ষ্য করেননি। প্রত্যেক সরকারই দাবি করেছে, সর্বকালের সর্বসেরা শিক্ষানীতিটি তারা প্রণয়ন করবেন। রাজনীতির চরম বিভাজন প্রক্রিয়ার ঢেউ এসে পড়েছে শিক্ষাঙ্গনেও। এমনকি দেশে যখন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকে তখনও শিক্ষাঙ্গনগুলো উত্তপ্ত হতে দেখি দলীয় ও স্থানীয় রাজনীতির সর্বনাশা প্রশ্রয়ে। রাজশাহী ও শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রমাণ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি নিয়ে একদল ছাত্র ও তরুণ যে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়েছে তা দুর্ভাগ্যজনক। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে বিভাগীয় অ্যাকাডেমিক

এসএসসি বা আলিম পড়তে পারে। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে এ বিধিনিষেধ নতুন নয়। এক সময় এসএসসি পর্যন্ত অভিন্ন পাঠ্যক্রম ছিল। এইচএসসিতে গিয়ে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বা কলা বিভাগে ভর্তি হতো। এখন তো এসএসসিতে বিষয়টি বিলুপ্ত করা আছে। কলা বিভাগে এসএসসি পাস করা কোন শিক্ষার্থী এইচএসসিতে বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে পারে না। যেমন পারে এইচএসসিতে কলা ও বাণিজ্যের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি নিয়ে যে বিরোধ দেখা দিয়েছে তাতে শিক্ষার্থীরাই কেবল জড়িয়ে পড়েনি, বিভক্ত হয়ে যায়নি। বিভক্ত হয়েছেন শিক্ষকরাও। একদল শিক্ষক বলছেন, ১০০ নম্বর ধারীদেরও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে ভর্তির সুযোগ দিতে হবে। আরেক দল বলছেন, একাডেমিক কাউন্সিলে গৃহীত সিদ্ধান্ত বদলানো যাবে না। সর্বসম্মতভাবে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের জন্য আইন পরিবর্তন করা যাবে না। এ দাবি মেনে নিলে অন্যরাও বলবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির অন্যান্য শর্তও শিথিল করতে হবে।

যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ও মানোন্নয়নে শিক্ষকরা সচেষ্ট থাকবেন সেখানে ভর্তি পদ্ধতি নিয়ে তারা ঝগড়ায় নেমেছেন। সাদা

নিয়ে আসা কেবল কঠিন নয়, অসম্ভবও।

শিক্ষাবিদ-লেখক হাসান শফি 'বাংলাদেশের শিক্ষার ব্যবস্থা, অব্যবস্থার চালচিত্র' নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন, "বললে অত্যুক্তি হবে না যে— আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা দেশকে মোটের ওপর একদল গোঁড়া, ধর্মান্ধ, জীবন ও জগৎবিমুখ 'বান্দা' উপহার দিচ্ছে। অন্যদিকে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা-ব্যবস্থা বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকেও বেরোচ্ছে একটি স্বার্থপর বা ভীষণ আত্মকেন্দ্রিক ও নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীন, দেশপ্রেমের অনুভূতি বর্জিত ও সামাজিক দায়বোধহীন রোবট প্রজন্ম। দুয়ের মধ্যে কোনটি বেটার বা কম মন্দ সে বিতর্কে না গিয়েও আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, দুই ব্যবস্থাই আমাদের জাতি গঠনের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করছে।"

অর সুপারিশ হল, "সাধারণ শিক্ষাকে মূলধারা স্পর্শ করেই সতর্ক ও দূরদর্শী পরিকল্পনার মাধ্যমে, এর সঙ্গে প্রচলিত অন্য ধারাগুলোর ব্যবধান, সম্ভবের শেষ সীমা পর্যন্ত কমিয়ে আনা। আর তার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপক সংস্কার— আধুনিকায়ন ও মানোন্নয়ন যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনি সাধারণ ধারাতে ধর্মীয় বা নীতি শিক্ষার সংস্থান (অন্তত যারা তা নিতে চায় তাদের জন্য) রাখতে হবে।

ভাষা বলে না হয় শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে রপ্ত করতে পারে না কিন্তু বাংলা ভাষাটিও কি তারা শুদ্ধ করে লিখতে পারে? কেন পারে না? এর জন্য শিক্ষার্থীরা দায়ী নয়, দায়ী হল শিক্ষা পদ্ধতি। শিক্ষাবিমুখ শিক্ষকমণ্ডলী। এভাবে কোন জাতি এগোতে পারে না। ভাষা আন্দোলনের জন্য, ভাষা শহীদদের জন্য আমরা গর্ববোধ করি। প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি কালো ব্যাজ পরে শহীদ মিনারে যাই কিন্তু বাংলা ভাষার উন্নয়নে কোন গবেষণা হচ্ছে না।

আজকাল উচ্চবিত্ত তো বটেই, মধ্যবিত্তের একাংশের মধ্যেও বাংলা ভাষা চর্চায় চরম অনীহা লক্ষ্য করা যায়। তারা ছেলেমেয়েদের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ান আর বাংলার পক্ষে বক্তৃতা দেন। স্কুল-কলেজ পাস করলে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান, তাও সম্ভব না হলে অন্তত দেশীয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম লেখান। ফলে ভাষার জন্য রক্ত দেয়া বিত্তবান বাঙালির জন্য আজ বাংলা নির্বাসিত। সেদিন এক বন্ধু আক্ষেপ করে বলেছিলেন, তিনি ত্রিশ বছর ধরে সরকারি অফিসে চাকরি করেছেন। নথিপত্র বাংলায় লিখেছেন। তার পুত্রকেও বাংলা মাধ্যমে পড়িয়েছেন। কিন্তু তার সেই পুত্র কোথাও চাকরির দরখাস্ত করলে, কিংবা ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করা হয় ইংরেজিতে নথিপত্র লিখে পাঠাতে পারবেন কিনা? আমরা বুঝি না বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়া দেশের ভেতরে প্রশাসনিক বা দাফতরিক কাজকর্মের জন্য ইংরেজি ভাষার দরকারটা কি? মনে আছে বহু বছর আগে কবি মোহাম্মদ রফিক বাংলাদেশে সর্বস্তরে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন নেই বলে একটি প্রবন্ধ লিখে তোলপাড় সৃষ্টি করেছিলেন। তখনও বাংলা ভাষার প্রতি সরকারের নিতিনির্ধারক তথা, পাশ্চাত্যে শিক্ষাগ্রহণকারী শিক্ষকদের কিছুটা আগ্রহ ছিল, এখন সেটুকুও নেই। সে